সুলতান
আলপ আরসালান

ইমরান রাইহান

উমেদ
প্র কা শ
তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত

সেলজুক সালতানাত

অধিষ্ঠিত করতে। এসব সালতানাতের শাসকদের মধ্যে অনেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাসকও এসেছিলেন, যারা নানাভাবে নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হলো, তারা মুসলিম-বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি। মুসলমানরা সে সময় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বদলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল। জন্ম নিচ্ছিল একের পর এক ফিরকা।

এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সালতানাত ছাড়াও আরও দুটি সাম্রাজ্য টিকে ছিল সে সময়। একটি ছিল স্পেনে উমাইয়াদের স্বাধীন সাম্রাজ্য। ৩৫০ হিজরীর মধ্যে এটি তার উন্নতির শীর্ষে পৌঁছায়। তারপর ইতিহাসের সাধারণ নিয়মানুযায়ী এটি পতনের দিকে এগিয়ে যায়। ৪২২ হিজরীতে এটি খণ্ড খণ্ড হয়ে আঞ্চলিক প্রশাসকদের কাছে ক্ষমতা বণ্টিত হয়ে যায়। পরে এটি যথাক্রমে মুরাবিতিন ও মুওয়াহহিদিনদের হাতে চলে যায়। উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শিয়াদের সাম্রাজ্য। তারা নিজেদেরকে হযরত ফাতেমা রা.-এর বংশধর দাবি করে এই সাম্রাজ্যকে ফাতেমী সাম্রাজ্য বললেও আলেমরা তাদের এই বংশধারাকে স্বীকৃতি দেননি। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল উবাইদী সাম্রাজ্য[২]। ধীরে ধীরে এটি শক্তি অর্জন করে এবং মিসর দখল করে নেয়।

২. উবাইদী সাম্রাজ্য : মিসরে প্রতিষ্ঠিত একটি শিয়া সাম্রাজ্য। তাদের শাসনকাল ৯০৯-১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ। উবাইদী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা উবাইদুল্লাহ মাহদী। সে ছিল শিয়া। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী সিয়ারু আলামীন নুবালাতে লিখেছেন, উবাইদুল্লাহ আবু মুহাম্মাদ বাতেনী উবাইদীদের প্রথম শাসক। তারা ইসলামকে পরিবর্তন করেছিল, শিয়া মতাদর্শ প্রচার করেছিল। উবাইদীদের শাসনকালে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। তারা বিকৃত আকীদা-বিশ্বাস প্রচার করত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : ডক্টর আলী মুহাম্মাদ আস সাল্লাবী রচিত 'আদ দাওলাতুল ফাতিমিয়্যা আল উবাইদীয়্যা'।

করার কেউ ছিল না। ৩৬১ হিজরীতে রোমানরা এডেসা[৮] আক্রমণ করে। বাগদাদের বুওয়াইহী শাসক তখন শিকারে মত্ত ছিল।

মোটকথা, মুসলিম-বিশ্ব তখন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল। তারা কোনো আশার আলো দেখছিল না। আব্বাসী খলিফার পদটি টিকে ছিল ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে। কার্যত তিনি ছিলেন অসহায়। এই সময়ে এগিয়ে আসে সেলজুকরা। সেলজুকদের আদি নিবাস ছিল তুর্কীস্তান ও চীনের মধ্যবর্তী এলাকায়। বুগলাকের পুত্র সেলজুক ছিলেন

তুর্কী সম্রাটের সেনাপতি। সম্রাটের সাথে মনোমালিন্যের কারণে তিনি নিজের এলাকা ত্যাগ করে মুসলিম ভূখণ্ডে চলে আসেন এবং এখানে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার সন্তানরা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তার নাতি তুগ্রিল বেগ গজনীর শাসকদের সাথে লড়াই করে বেশকিছু এলাকা নিজের দখলে নিয়ে আসেন।

৪৩৩ হিজরীতে তুগ্রিল বেগ নিশাপুর, জুরজান ও তবারিস্তান দখল করেন। তুগ্রিল বেগ ক্রমেই শক্তি অর্জন করছিলেন। সে সময় একদিকে ছিল দুর্বল আব্বাসী খিলাফাহ, যাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল বুওয়াইহীদের হাতে। আব্বাসী খলিফা ছিলেন তাদের হাতে নির্যাতিত। ফলে খলিফার একজন শক্তিশালী সুন্নী মিত্র দরকার ছিল। আর অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান সেলজুকদের দরকার ছিল স্বীকৃতি। এই পারস্পরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে সেলজুকদের সাথে আব্বাসী খলিফা কায়েম বি

---

৮. এডেসা : বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর। ক্রুসেড চলাকালে এখানে ক্রুসেডারদের ঘাঁটি ছিল। ইমাদুদ্দীন জেংগী তাদের হাত থেকে এই শহরটি উদ্ধার করেন। ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শহরটির অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় সামরিক বাহিনীগুলো সব সময় এই শহরটি নিয়ন্ত্রণে পেতে চাইত।

আলপ আরসালান

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আপনি ভয় পাবেন না। আমি আপনার জন্য এমন এক বাহিনীর খোঁজে আছি, যারা যেকোনো বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে। সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, কারা সেই বাহিনী? নিযামুল মুলক জবাব দিয়েছিলেন, তারা হলেন নেককার আলেম ও ফকীহদের জামাত, যারা নিয়মিত আপনার জন্য দুআ করেন। এই কথা শুনে সুলতান চিন্তামুক্ত হন। কুতুলমুশের এই বিদ্রোহটি সুলতান বেশ সহজভাবেই সামাল দিতে পেরেছিলেন। কুতুলমুশের বিশাল বাহিনী সুলতানের বাহিনীর সামনে পরাজিত হয়েছিল।[১২]

তুগ্রিল বেগের শাসনকালের শেষদিকে আব্বাসী খলিফা কায়েম বি আমরিল্লাহর সাথে তার সম্পর্কের কিছুটা অবনতি ঘটেছিল। তিনি খলিফার অমতে তার মেয়েকে বিবাহ করেন। ৪৫৬ হিজরীতে আলপ আরসালান খলিফার মেয়েকে বাগদাদে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। আলপ আরসালানের এ সিদ্ধান্তে খলিফা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। তিনি বাগদাদের মসজিদগুলোতে আলপ আরসালানের জন্য দুআ করার নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। দুআর মধ্যে বলা হয়েছিল,

> ‘হে আল্লাহ, মহান সুলতান আযদুদ দৌলাহ, জাতির শিরোমণি আলপ আরসালান, আবু শুজা (দুঃসাহসী বীর) মুহাম্মাদ ইবনু দাউদকে আপনি সার্বিক কল্যাণ দান করুন।’

এরপর খলিফা প্রতিনিধির মাধ্যমে সুলতান আলপ আরসালানের কাছে নিজের বিশেষ তরবারি উপহার পাঠিয়েছিলেন। খলিফার সাথে সুলতানের সুসম্পর্কের ফলে আলপ আরসালান অনেকটাই নিশ্চিন্ত হন।[১৩] সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য খলিফার সাথে সুসম্পর্ক বজায়

১২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৫/৭৯৩

১৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৫/৭৯৪; আল কামীল ফিত তারীখ, ৮/৩৬৬

মানজিকার্টের যুদ্ধ

সামরিক অভিযানের পরিবর্তে তারা শুধু বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই অভিযান পরিচালনা করতেন। তবে বাইজেন্টাইনরা বরাবরই আব্বাসীদের সমীহের চোখে দেখতে বাধ্য হতো। খলিফা হারুনুর রশিদের সময় সম্রাট নাইসফোরাস চুক্তি ভঙ্গ করলে সুলতান তাকে কঠোর জবাব দিয়েছিলেন। তার পরেও বিভিন্ন সময় আব্বাসীরা তাদের অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে কখনো কখনো বাইজেন্টাইন, আনাতোলিয়ার ভেতরেও প্রবেশ করতেন। যেমন : মুতাসিমের শাসনামলের (৮৩৩-৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ) মাঝামাঝি ৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য-পশ্চিম আনাতোলিয়ায় অ্যামোরিয়ামে মুসলিম বাহিনী অভিযান পরিচালনা করে শহরটি জয় করে।

তবে নবম শতাব্দীর শেষদিকে পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। এ সময় আব্বাসীরা তাদের শক্তি হারাতে থাকে। তাদের মাথার ওপর কর্তৃত্বের ছড়ি ঘুরাতে থাকে অন্যরা। আব্বাসীদের অর্থনীতি হ্রাস পাচ্ছিল এবং সরকার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলাদলি দ্বারা পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। এই বিভক্তি ও দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল বাইজেন্টাইনরা। তারা হারানো সাহস ফিরে পায়। একের পর এক অভিযানের মাধ্যমে শতাব্দীর পরিক্রমায় তাদের হারিয়ে যাওয়া প্রদেশ ইলিরিকাম, গ্রিস, বুলগেরিয়া, উত্তর সিরিয়া, সিলিসিয়া এবং আরমেনিয়া পুনরুদ্ধার করে। তাদের বিরুদ্ধে খিলাফত কিংবা অন্য শাসকদের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সত্যি বলতে সে সময় এ ধরনের কোনো অভিযান পরিচালনার সাহস ও শক্তিই ছিল না কারও। বাইজেন্টাইনরা ক্রমেই লোভী হয়ে উঠছিল এবং তারা তাদের হারানো অঞ্চলগুলো ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে নতুন এক শক্তির আবির্ভাব পরিস্থিতি বদলে দেয়। নতুন এই শক্তি ছিল সেলজুক তুর্কীরা—যারা আব্বাসী খিলাফতকে পতনের হাত থেকে রক্ষা

ছিল না। অথচ তাকে রোমানোসের মোকাবেলা করতে হবে দ্রুতই। সুলতানের সামনে তখন দুটি পথ খোলা ছিল। হয়তো মোকাবেলা, নয়তো পলায়ন। সুলতান প্রথমটিই বেছে নিলেন।

তিনি দ্রুত নিজের বাহিনী নিয়ে মানজিকার্টের দিকে এগিয়ে এলেন। এটি ছিল তার সাহসের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। শক্তির বিচারে তার বাহিনী রোমানোসের বাহিনীর ধারেকাছেও ছিল না। পথে সুলতানের বাহিনী রোমানোসের বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের মুখোমুখি হলো। এই বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল ১০ হাজার। সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর এই বাহিনী পরাজিত হয়। তাদের সেনাপতিকে গ্রেফতার করা হয়। সুলতান আলপ আরসালান তার বাহিনী নিয়ে রোমানোসের বাহিনীর কাছাকাছি পৌঁছে যান। এরপর তিনি দূত পাঠিয়ে রোমানোসকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন। রোমানোস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। সে জবাব দিয়েছিল, আমি অনেক সম্পদ ব্যয় করেছি এবং এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছি আজকের এই পরিস্থিতির জন্য। সুতরাং কোনো সন্ধি বা চুক্তির পথে আমি যাব না। আমি মুসলিম ভূখণ্ডের সেই অবস্থাই করব, যা করা হয়েছে রোমানদের ভূমির সাথে ।[৩৩]

রোমানোস আরেকজন দূতের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠিয়েছিল, যাতে তার দম্ভ ও আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছিল। সেই বার্তায় সে বলেছিল,

> আমি এমন বাহিনী নিয়ে এসেছি, আপনি যার প্রতিরোধ করতে পারবেন না। তাই স্বেচ্ছায় আমার আনুগত্য মেনে নিন।

তার এই বার্তা সুলতান আলপ আরসালানকে ক্রুদ্ধ করেছিল। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, তোমার মনিবকে বলো, আমার রব আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, যেন আমি তাঁর প্রশংসা করতে পারি। আমার

৩৩. আল মুন্তাজাম ফি তারীখিল মুলুকী ওয়াল উমাম, ১৬/১২৪

সুলতানের এই কান্না ও মুনাজাতের দৃশ্য সেনাবাহিনীকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল বদরের যুদ্ধের কথা, যেদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শুরুর আগে বারবার আল্লাহর কাছে দুআ করে সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করছিলেন।[৪০]

বাইজেন্টাইনরা তাদের বাহিনীকে পাঁচটি সারিতে বিন্যস্ত করেছিল। সুলতান জানতেন তার সেনাবাহিনীর স্বল্পতার কথা। ফলে তিনি তার বাহিনীকে বিন্যস্ত করলেন চন্দ্রাকৃতিতে, একটি সারিতে। ফলে তার সেনাসংখ্যা প্রকৃত সেনাসংখ্যার চেয়ে কিছুটা বেশি দেখাচ্ছিল। মুসলিম শিবিরে চলছিল কুরআন তিলাওয়াত, বাইজেন্টাইন শিবিরে বাজছিল যুদ্ধের নাকাড়া।

সুলতান আলপ আরসালান তার ঘোড়ায় আরোহণ করে সৈন্যবাহিনীর সাথে একত্র হয়ে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর দিয়ে বাইজেন্টাইনদের দিকে এগিয়ে গেলেন। মুসলিম সেনাদের তাকবীরের ধ্বনিতে চারপাশ কেঁপে উঠেছিল। এই চার্জটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, মুসলিম সেনাদের ঘোড়ার পদাঘাতে যে ধুলো উড়ছিল তা বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনীকে আচ্ছাদিত করে ফেলে।

যুদ্ধ শুরু হয়। দুই বাহিনী তীব্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে একে অপরের ওপর। সেনাদের ঘোড়ার পদাঘাতে ধূলি উড়তে থাকে। ঝাপসা হয়ে ওঠে চারপাশ। মুসলিম সেনাদের তাকবীর ও রোমান সেনাদের চিৎকারের ধ্বনি ভাসতে থাকে বাতাসে। সুলতান আলপ আরসালান এ যুদ্ধে একজন সাধারণ সেনার মতোই লড়াই করছিলেন। তিনি বিরামহীনভাবে অস্ত্র চালাচ্ছিলেন। নিজের জীবনের পরোয়া না করে

৪০. আল কামীল ফিত তারীখ, ৮/৩৮৯

সুলতান আলপ আরসালান অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন। একবার তিনি জানতে পারেন, একজন গোলাম তার এক সঙ্গীর চাদর নিয়েছে। সুলতান তখন ওই গোলামকে কঠোর শাস্তি দেন, যেন অন্য কেউ এ ধরনের অপরাধ করার সাহস না করে। আরেকবার সুলতানের কাছে নিযামুল মুলক সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল কেউ একজন। তার অভিযোগ ছিল, নিযামুল মুলক বিভিন্ন শহরে অবৈধ সম্পদ সঞ্চয় করেছেন। সুলতান তখন নিযামুল মুলককে ডেকে পাঠান। নিযামুল মুলক উপস্থিত হলে সুলতান বললেন, যদি সত্যিই তুমি এই অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকো, তাহলে দ্রুত নিজের সংশোধন করে নাও। আর যদি অভিযোগকারী ভুল বলে থাকে, তাহলে তাকে মাফ করে দাও।[৪৪]

৪৬৪ হিজরীতে বাগদাদে মদ বিক্রি শুরু হয়। শায়খ আবু ইসহাক সিরাজী এ সময় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সুলতানকে লিখিত আকারে এ বিষয়ে অবগত করেন। সুলতান দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার আদেশ দেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই অপরাধীদের পাকড়াও করা হয়। মদ বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়।[৪৫]

সুলতান আলপ আরসালানের শাসনামলে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়। সুলতান নিজেই ছিলেন পৃষ্ঠপোষক।

***

৪৫৭ হিজরীর কথা।

সুলতান আলপ আরসালান গেলেন নিশাপুর ভ্রমণে। সাথে ছিলেন বিশ্বস্ত উযির নিযামুল মুলক খাজা হাসান তুসী। সুলতানকে অভ্যর্থনা

৪৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৬/৩৯
৪৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৬/৩৯

ইউসুফ দ্রুত সুলতানের দিকে এগিয়ে আসে। তার জামার ভেতর খঞ্জর লুকানো ছিল। সে ত্বরিতগতিতে খঞ্জর দিয়ে সুলতানকে আঘাত করে। সুলতান আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সেনাবাহিনীর লোকেরা দ্রুত এগিয়ে এসে ইউসুফকে ধরে ফেলে। তাকে হত্যা করা হয়।

সুলতান কয়েক দিন মুমূর্ষু অবস্থায় কাটান। এ সময় তিনি বলেছিলেন, কিছুদিন আগে আমি পাহাড়ের ওপর উঠে আমার সেনাবাহিনীর দিকে তাকিয়েছি। এই বিশাল সেনাবাহিনী দেখে তখন আমার বুক গর্বে ফুলে ওঠে। আমি মনে মনে বলি, পৃথিবীতে আমার চেয়ে শক্তিশালী আর কোনো শাসক নেই। আল্লাহ আমার এই গর্ব চূর্ণ করেছেন। তার এক দুর্বল সৃষ্টি দ্বারা আমাকে পরাস্ত করেছেন। আমি মনের এই খেয়ালের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। চারদিন আহত থেকে রবিউল আউয়ালের ১০ তারিখ তিনি ইন্তেকাল করেন। দিনটি ছিল শনিবার।

মৃত্যুকালে সুলতান আলপ আরসালানের বয়স ছিল ৪১ বছর। তাকে সমাহিত করা হয়েছিল তার নিজ শহর মার্ভে, তার পিতার কবরের পাশে। তার কবর-ফলকে লিখে দেওয়া হয়েছিল, 'যারা সুলতান আলপ আরসালানের আকাশসম জাঁকজমক দেখেছ, দেখো, তিনি এখন ধূসর মাটির নিচে শায়িত...।'[৫০]

সুলতানের মৃত্যু-সংবাদ বাগদাদ পৌঁছালে জনসাধারণ সুলতানের জন্য শোক প্রকাশ করতে থাকে। বন্ধ হয়ে যায় হাট-বাজার ও বেচাকেনা।

---

৫০. আল কামীল ফিত তারীখ, ৮/৩৯৩, ইবনুল আসীর; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনু কাসীর; আল মুন্তাজাম ফি তারীখিল মুলুকী ওয়াল উমাম, ১৬/১৪৪, ইবনুল জাওযী; আস সালাজুকা তারীখুহুমুস সিয়াসী ওয়াল আসকারী, ৮৯, ৯০, ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল আজিম ইউসুফ, আইনুন লিদ দিরাসাত ওয়াল বুহুসুল ইনসানিয়্যা ওয়াল ইজতিমাইয়্যা, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ; The encyclopaedia of Islam, page 420-421, volume-2, ej brill, 1986, leiden.

জীবন ও কর্ম আমাদেরকে নিজেদের সকল প্রচেষ্টা ও কর্ম উম্মাহর কল্যাণে ব্যয় করার শিক্ষা দেয়।

হযরত উমর রা. একদিন তার সামনে উপস্থিত ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যদি এই কক্ষ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, মুয়াজ ইবনু জাবাল এবং আবু হুজাইফার আযাদকৃত গোলাম সালেমের মতো ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ণ থাকত, তাহলে আমি তাদের সাহায্যে এই দ্বীনের কালিমাকে সুউচ্চ করার চেষ্টা চালাতাম।[৫৫]

হযরত উমর রা.-এর এই উক্তি আমাদের সামনে তুলে ধরে, উম্মাহর জন্য তার সন্তানদের কতটা প্রয়োজন। উম্মাহর জন্য এমন কিছু ব্যক্তির প্রয়োজন যারা নিজেদের কোরবান করে উম্মাহর কল্যাণ সাধনে কাজ করে যাবেন। সুলতান আলপ আরসালান ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তি।

৫৫. আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, বর্ণনা নং : ৫০০৫। যাহাবী এটিকে সহীহ বলেছেন।